দৈনিক জনকণ্ঠ

2

তারিখ 22 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈঃ জনকণ্ঠ

শিক্ষা, পরীক্ষা ইত্যাদি

পরীক্ষা পদ্ধতিসহ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার আমূল সংস্কার। লক্ষ্য হচ্ছে, ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া। লক্ষ্য, শিক্ষাকে অর্থবহ, উৎপাদনমূলক, কার্যকর একটি ব্যবস্থায় পরিণত করা। শিক্ষা হবে দেশ গড়ার হাতিয়ার।

শিক্ষা হবে জনগণের সম্পদ। শিক্ষার দ্বার সকল মানুষের জন্য হবে অবারিত। সাংবিধানিকভাবে, নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে শিক্ষা দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। 'দীর্ঘ পঁচিশ বছর এগুলো নিহায়ত 'কথার কথা' হয়ে রয়েছে। এগুলোকে করে তুলতে হবে কাজের কথা।

এখন সেই সময় এসেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখনও দেশের ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেই মাত্র তা করা সম্ভব।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কেরালা রাজ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা এক শ' ভাগ এবং অন্য দুয়েকটি রাজ্যে শিক্ষিতের উচ্চহার অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধু শিক্ষা বিস্তারকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার মাধ্যমেই। শুধু সরকারী উদ্যোগ নয়, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবামূলক ব্যাপক তোড়জোড় ও তাগিদ সম্মিলিত দেশে অমন এক বিরাট মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের আশপাশের আরও অনেক দেশেই যেমন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, এমনকি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধাবস্থায় নিমজ্জিত শ্রীলঙ্কায়ও শিক্ষিতের হার অনেক বেশি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেসব দেশে দৃঢ়ভাবেই উৎপাদনমূলক করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষাকে সে সব দেশে নেয়া হয়েছে দেশগড়ার হাতিয়ার হিসাবেই।

এ জন্য সবচাইতে আগে দরকার দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নের দৃঢ়সঙ্কল্প।

এ সরকার মাত্র ক্ষমতায় বসেছে। রাতারাতি দেশে বহু যুগের জমাট বাঁধা অশিক্ষার অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, তা আমরা মনে করি না। দেশের মানুষ মোটেই অবুঝও নয় যে, তাদের কাছ থেকে সে রকম প্রত্যাশা করবে। কিন্তু কথায় বলে, 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'। সরকার তার মেয়াদকালে কতদূর কী করবে, সেটার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথম থেকেই তাদের কথাবার্তায়, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার কথা আমরা আগেই তুলে ধরেছি। দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার পরিকল্পনা তাঁর সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। সে লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও সরকারকে রাখতে হবে এবং অতীতের মতো তার মধ্যে কোন শুভঙ্করের ফাঁক থাকবে না।

শিক্ষা বিস্তারকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে, শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে যেসব বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে, সরকার তাদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইউনিসেফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তাকেও সরকার কাজে লাগাতে পারে।

তবে সব কিছুর আগে দরকার ত্বরিত সুষ্ঠু নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ।

শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পরীক্ষা পদ্ধতির ও শিক্ষাদান পদ্ধতির কথাও অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। এসব পদ্ধতির মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতা, নানা রকম অনিয়ম ও দুর্নীতির কীট বাসা বেঁধে আছে। সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার হঠাৎ নেমে যাওয়ার ভিতর দিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির ও সেই সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতিরও অসারতা নগ্ন হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নব্যাংক নির্ভর কিংবা শিক্ষার্থীদের শুধু টিউটর-নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতিকে 'স্পুন ফিডিং'য়ে পর্যবসিত করা যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের তথা দেশের জন্য কখনই কল্যাণকর হতে পারে না, তা আজ আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া এর আগে কম্পিউটারায়নের নামে ব্যাপক হারে পরীক্ষার ফল বিভ্রাট ঘটিয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জীবনে দুর্ভোগ ও করুণ পরিণতি ডেকে আনার ঘটনাও ঘটেছে। আবার অভিযোগ রয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষায় ভিন্ন কলেজে একশ্রেণীর শিক্ষককে উৎকোচ না দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়া হয়। আর প্র্যাকটিক্যালে ফেল করার জন্য একজন শিক্ষার্থীর পুরো বছরটা মাটি হয়ে যায়। ঢাকার দুয়েকটি সরকারী কলেজে এ জাতীয় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার কথা বেশ প্রচারিত হয়ে আছে। এর ওপর এখন গত শনিবারের জনকণ্ঠে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইচএসসি'র প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা সম্পর্কে সম্প্রতি এক নতুন নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট কলেজের কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকতে পারবেন না। শুধু বাইরের শিক্ষক প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেবেন। শিক্ষার্থীকে যাতে মুখ চিনে নম্বর না দেয়া হয়, সে জন্যই নাকি এই নতুন পদ্ধতি। অদ্ভুত! দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার্থী তথা শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শেষ নেই।

সমস্যাটা পক্ষপাতিত্বের নয়। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাওয়াটাই সমস্যা। মনোদৃষ্টিটা সে সমস্যা দূর করার দিকেই নিবদ্ধ করা দরকার। নইলে কৃত্রিম ও উপরসাভাবে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

গলদ ও অনিয়ম-অসাধুতা প্রকৃতপক্ষে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রেই ঢুকে আছে। কোথাও স্কুল-কলেজ বলতে একেবারেই কিছু নেই, আবার কোথাও পাল্লা দিয়ে বেশ কিছু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অনেকটা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকেই। আবার বহু স্কুল-কলেজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, শ্রেণী কক্ষ, সরকারী অর্থ সহায়তা নেই। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও এ জাতীয় সমস্যার খবর চোখে পড়বেই। দেশে সার্বিক চাহিদার মাপকাঠিতে একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুলই রয়ে গেছে। তেমনি প্রধানত দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণেই বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের 'ড্রপ আউট'-এর বা অকালে বাধ্য হয়ে পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়ার হারও খুব বেশি। এতে দেখা যায়, নানা দিক থেকেই দেশে কার্যত শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতিই চলছে। অতীতের সরকারগুলো শিক্ষা বিস্তারের বা পরীক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত করার কৃত্রিম ও অবাস্তব সব পদক্ষেপই নিয়েছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, পথকলি ট্রাস্ট প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবানুগ না হওয়ায় এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

সত্যিকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাই সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে এবং আশু ও দীর্ঘমেয়াদী দু'ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য দশ বছরের বা সম্ভব হলে তার চাইতে কম সময়ের টার্গেট নিয়ে একটি স্বল্পমেয়াদী ক্র্যাশ প্রোগ্রাম যেমন গ্রহণ করা দরকার, তেমনি শিক্ষাকে অর্থবহ, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বজনীন করে তুলে জনগণের সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক কর্মযজ্ঞও হাতে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বের দরবারে শিক্ষাই আমাদের জাতির জন্য প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা বয়ে আনবে— নিয়ে যেতে সক্ষম হবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির শিখরে।